তৃতীয় পরিচ্ছেদ : খরা (Drought) 2.3

'খরা' বলতে বোঝায় এমন একটি আবহাওয়াগত পরিস্থিতি, যেখানে দীর্ঘসময় ধরে বৃষ্টি না হওয়ার ফলে বাতাস, ভূপৃষ্ঠস্থ জলসম্পদ এবং মৃত্তিকা শুষ্ক হয়ে গেছে, আর ফলস্বরূপ স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কোন এলাকায় কখন সরকারিভাবে খরা ঘোষণা করা হবে, সেটা নির্ভর করে ওই এলাকার সার্বিক জলবায়ু, ভূমিরূপ, মৃত্তিকা, ফসলের প্রকৃতির উপর। তাই দেশে দেশে খরার সংজ্ঞা বিভিন্ন। নিরক্ষীয় এলাকার বালিদ্বীপে প্রতিদিনই পরিচলন বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে টানা 6 বা তার বেশি দিন বৃষ্টি না হলে খরা পরিস্থিতি ধরা হয়। আবার মরুভূমির দেশ লিবিয়াতে টানা দু'বছর বৃষ্টি না হলে খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়। Australian Bureau of Meteorology-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী বছরের কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অস্ট্রেলিয়ার কোনো এলাকায় যদি স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের 10% বা তারও কম বৃষ্টি হয় এবং এই পরিস্থিতি টানা তিন মাস চলতে থাকে তবে খরা হয়েছে বলে ধরা হয়।

খরা বিভিন্নরকম হতে পারে, নিচের ছকে বিভিন্ন ধরনের খরা দেখানো হল—

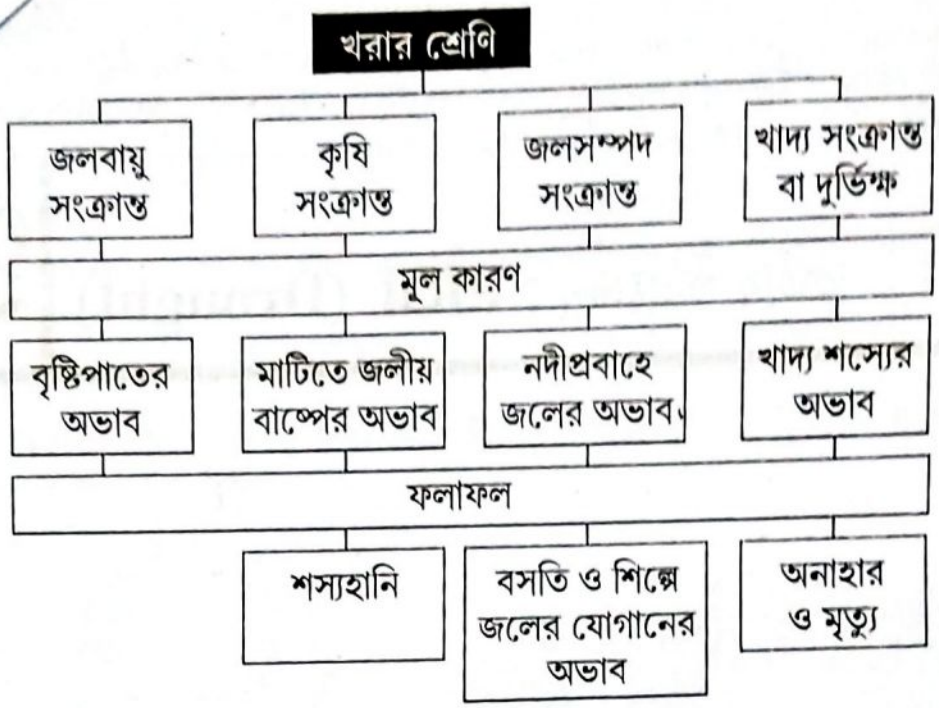

আমাদের দেশেও বিভিন্ন সরকারি দপ্তর তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে খরার সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করেছেন। যেমন IMD (Indian Meteorological Department) খরার জলবায়ু সংক্রান্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন।

খরার জলবায়ু সংক্রান্ত সংজ্ঞা (Definition of Meteorological Drought)

IMD দ্বারা গৃহীত খরা নীতি—

(1) **অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত পরিস্থিতি ঃ** সাধারণত 70 থেকে 100 বছরের মোট বৃষ্টিপাতের গড়কে কোনো এলাকার স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হিসেবে ধরা হয়। কোনো বছর যদি স্বাভাবিকের চেয়ে 20% বা তার অধিক বৃষ্টি ($\geq 20\%$) হয়, তবে তখন অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বলে ধরা হবে।

(2) **স্বাভাবিক বৃষ্টি পরিস্থিতি ঃ** যেসকল বছরে কোনো অঞ্চলে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের চেয়ে 19% বেশি থেকে 19% কমের মধ্যে থাকে (অর্থাৎ বৃষ্টিপাত +19% থেকে −19%-এর মধ্যে থাকে) তবে সেইসব বছরে স্বাভাবিক বৃষ্টি হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

(3) **খরার সূত্রপাত ঃ** কোনো এলাকায় কোনো একটি বছরে যদি স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত না হয়ে, তার 25% কম বৃষ্টি হয় (25% negative departure from normal rainfall) তবে সেই বছর সেই এলাকায় খরা হয়েছে বলতে হবে। অর্থাৎ প্রকৃত বৃষ্টিপাত যদি স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের 75% মতো হয়, বা তার থেকেও কম হয়, তাহলে খরা হয়েছে বুঝতে হবে।

(4) **মাঝারি খরা পরিস্থিতি ঃ** প্রকৃত বৃষ্টিপাত যদি মোট স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের 75% থেকে 50%-এর মধ্যে হয় (অর্থাৎ departure from normal rainfall : 25% to 50%) তাহলে ওই এলাকায় মাঝারি তীব্রতার খরা (Moderate drought) হয়েছে বুঝতে হবে।

(5) **তীব্র খরা পরিস্থিতি ঃ** প্রকৃত বৃষ্টিপাত যদি মোট স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের 50%-এর থেকেও কম হয় (অর্থাৎ departure for normal >--50%) তবে ওই এলাকায় অতি তীব্র খরা (Severe drought) হয়েছে বুঝতে হবে।

(6) কোনো এলাকায়, যেমন ধরা যাক কোনো এক বছরে বাঁকুড়া জেলায় যদি মোট এলাকার 20% বা তার বেশি খরা পীড়িত হয়, তবে সেই জেলাটিকে ওই বছরে খরা আক্রান্ত বলা হয়।

(7) কোনো এলাকায় 100 বছরের মধ্যে যদি 20 বার বা তার বেশি খরার ঘটনা ঘটে, তবে ওই এলাকাটিকে সাধারণভাবে খরা আক্রান্ত (Drought affected area) বলা হবে।

(8) যদি 100 বছরের মধ্যে 40 বার বা তারও বেশি সংখ্যক বছরে খরার আক্রমণ ঘটে তবে ওই এলাকাটিকে তীব্র খরাপ্রবণ (Chronically drought prone area) বলা হবে।

খরার কৃষিসংক্রান্ত সংজ্ঞা (Definition of Agricultural Drought)

আবার ভারতবর্ষের কৃষিসংক্রান্ত খরার সংজ্ঞা বা দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। NCA (National Commission of Agriculture)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী খরিফ মরশুমে পরপর চার সপ্তাহে যদি প্রকৃত বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের 50% বা তার কম হয়, তখন তাকে খরা বলা হবে। রবি মরশুমে এই একই সংজ্ঞায় কেবল চার সপ্তাহের বদলে ছয় সপ্তাহ ধরা হবে। অর্থাৎ ফসল তার প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণ আর্দ্রতা না পেয়ে যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাকেই এক্ষেত্রে খরা বলা হবে।

খরার জলসম্পদ সংক্রান্ত সংজ্ঞা (Definition of Hydrological Drought)

জলসম্পদ সংক্রান্ত সংজ্ঞাও খরার জন্য দেওয়া যায়, কোনো স্থানে ভূপৃষ্ঠস্থ জলাশয়, নদী প্রভৃতিতে বা ভূগর্ভস্থ জলস্তরে, জলের উচ্চতা যদি স্বাভাবিকের থেকে 75% বা তার বেশি নেমে যায় এবং ফলস্বরূপ নদী, জলাশয়, ঝরনার জল শুকিয়ে যায়, তবে ওই স্থান খরা পীড়িত বলা যায়।

খরার অর্থনৈতিক সংজ্ঞা (Definition of Economic Drought)

খরার সঙ্গে ফসল উৎপাদনের ওতপ্রোত সম্পর্ক আছে। তাই উৎপাদনভিত্তিক অর্থনৈতিক সংজ্ঞাও খরার জন্য দেওয়া যেতে পারে। কোনো এলাকায় ফসল উৎপাদন যদি এমন কমে যায়, যাতে সার্বিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখনও ওই এলাকা খরা পীড়িত বলা যাবে।

এক নজরে খরা সৃষ্টির কারণ

(1) প্রধান কারণ হল আবহাওয়ার অস্থিরতায় বৃষ্টিপাত কমে যাওয়া। এই বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ার অনেক কারণ থাকতে পারে, যেমন—

(ক) মৌসুমি বৃষ্টির অনিশ্চয়তা (স্থানীয় প্রভাব)।

(খ) আবহাওয়ার উষ্ণায়ণ (Global warming) বিশ্বব্যাপী প্রভাব।

(গ) প্রচুর গাছ কেটে ফেলার জন্য আবহাওয়া শুষ্ক হয়ে যাওয়া।

(ঘ) আধাশুষ্ক অঞ্চলে অতিরিক্ত পশুচারণের ফলে তৃণাচ্ছাদন নষ্ট হয়ে যাওয়া।

(ঙ) প্রাকৃতিক কারণে মরুকরণের গ্রাসে পড়া।

(2) বৃষ্টি স্বাভাবিক আছে, কিন্তু ভূমিরূপের জন্য সব জল গড়িয়ে চলে যায়, মাটিতে একটুও জল সঞ্চিত হয় না, সবসময় শুষ্ক থাকে। এইরকম পরিস্থিতিতেও খরার সৃষ্টি হতে পারে।

খরা সৃষ্টির বিস্তৃত ব্যাখ্যা

জলবায়ুসংক্রান্ত খরা বা Meteorological drought-এর কারণ—

কোনো অঞ্চলের জলবায়ুতে বৃষ্টিপাতের অভাবজনিত খরা পরিস্থিতিতে মনে রাখতে হবে যে, **বৃষ্টির পরিমাণের চাইতে বৃষ্টির কার্যকারিতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।** ছাত্রছাত্রীরা সবাই জানে যে, চেরাপুঞ্জি পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃষ্টিবহুল অঞ্চল। কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত চেরাপুঞ্জি থেকে সমস্ত বৃষ্টির জল ভূমির ঢাল বরাবর গড়িয়ে নীচের অঞ্চলে চলে যায়। তাই চেরাপুঞ্জি ওই প্রচণ্ড বৃষ্টির সুফল পায় না। এটি একটি শুষ্কপ্রায় অঞ্চল।

ভারতবর্ষে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত হল 105 সেন্টিমিটার। পৃথিবীর নিরিখে এই পরিমাণ যথেষ্ট বেশি। কিন্তু এই বৃষ্টিপাত ভারতের সব জায়গায় সমভাবে বণ্টিত নয়। আবার বছরের সব সময়ে বৃষ্টি হয় না। সুতরাং সময় এবং স্থান দুটির নিরিখেই বৃষ্টি অসমভাবে বণ্টিত। এর সঙ্গে আবার মনে রাখতে হবে প্রতি বছর এই বণ্টনের হার সমান থাকে না। বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের গুণক (Coefficient of variation-C) নিম্নলিখিতভাবে গণনা করা যায়।

(b) ভূপৃষ্ঠ প্রবাহ (surface run-off) কমানো এই দুটি প্রক্রিয়া না সংঘটিত হলে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যায়, ফলে স্থানীয় বৃষ্টিপাত কমে যায়।

এ ছাড়াও গাছ কেটে ফেললে বাতাসে CO_2-এর পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে **আবহাওয়ার উষ্ণায়ন** আরও দ্রুত হয়। ফলে মাটি ও বাতাস দ্রুত শুকিয়ে যায়। বৃষ্টি আরও অনিশ্চিত হয়ে ওঠে।

(৪) মরুকরণ বা desertification প্রক্রিয়ার সঙ্গে বৃষ্টি কমে যাওয়ার যোগ আছে। প্রতিকূল আবহাওয়া এবং মানুষের অবৈজ্ঞানিক বেহিসেবি কার্যকলাপের ফলে ভূপৃষ্ঠস্থ জল ও ভূগর্ভস্থ জল সম্পদের অতিরিক্ত ক্ষয়ের ফলে মরুকরণ হয়। ফলে গাছপালা জন্মায় না এবং বৃষ্টিপাত আরও বেশি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

(9) মাটির লবণায়ন বা salinisation-এর ফলে মাটির উর্বরতা কমে যায়, বনসম্পদ নষ্ট হয়। তার ফলেও বৃষ্টির অনিশ্চয়তা বাড়ে।

জলসম্পদ সংক্রান্ত খরা সৃষ্টির কারণ

জলসম্পদ সংক্রান্ত খরা বা Hydrological drought-কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—

(1) ভূপৃষ্ঠস্থ জলসম্পদ সংক্রান্ত খরা (Surface water drought)

(2) ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ সংক্রান্ত খরা (Ground water drought)

Surface water drought-এর কারণ—

(a) পাহাড়ি অঞ্চলে উন্নয়নের নামে নদী উপত্যকায় বনাঞ্চল কেটে ফেলা হয়। ফলে এলাকার মাটি একটুও জল ধরে রাখতে পারে না। বর্ষার সময়ে নদী জলপ্রপাত ঝরনা প্রভৃতি পথ দিয়ে দ্রুত জল গড়িয়ে নীচু এলাকায় সরে যায়। বর্ষা কেটে গেলে ভূপৃষ্ঠস্থ জলসম্পদ শুকিয়ে যায়। মার্চ-এপ্রিল নাগাদ ভয়ানক জলকষ্ট শুরু হয়। চেরাপুঞ্জিতে প্রতি বছর ঠিক এই ঘটনাই ঘটে।

(b) নদী উপত্যকার বনাঞ্চল কেটে ফেলে সেখানে বাগিচা কৃষি তৈরি করলেও খরার সমস্যাকে ডেকে আনা হয়। স্বাভাবিক বন কেটে অর্থনৈতিক লাভের জন্য পাইন বা ইউক্যালিপ্টাসের চাষ করা হয়। এই গাছগুলির মাথায় পাতার আস্তরণ (Canopy cover) ঘন নয়। বৃষ্টিকে আটকাতে পারে না। প্রবল বৃষ্টি সরাসরি মাটিকে আঘাত করে ভূমিক্ষয় ঘটায়। হড়কা বান বা flash flood-এর প্রাদুর্ভাব ঘটে। বর্ষাকাল শেষ হওয়ার পর বছরের শুষ্ক সময়ে অঞ্চলটি খরাপীড়িত হয়ে পড়ে। উত্তর প্রদেশের তরাই অঞ্চলে ঠিক এই ঘটনাটিই ঘটেছে। ইউক্যালিপ্টাস জাতীয় গাছগুলির বাষ্পায়ন-প্রস্বেদন হার (evapotranspiration rate) খুব বেশি হওয়ার কারণে আবহাওয়া ও মৃত্তিকার জল আরও বেশি করে শুষ্ক হয়ে যায়। ফলে খরার তীব্রতা বাড়ে।

(c) অবৈজ্ঞানিক প্রথায় খনির কাজ, রাস্তা তৈরি, অতিরিক্ত পশুচারণ, কৃষি ইত্যাদির ফলে ভূপৃষ্ঠস্থ জলসম্পদ সংক্রান্ত খরা সৃষ্টি হয়। দুন উপত্যকায় চুনা পাথরের খনিগুলি নদীর প্রবাহ এমনভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছে যে, বর্ষাকালে নদীতে প্রবল বন্যা এবং শুষ্ক সময়ে খরার সৃষ্টি হয়।

এইভাবে কোনো এলাকায় জলসম্পদের ভারসাম্যের অভাব ঘটলে, স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত পরিস্থিতিতেও তীব্র খরার সৃষ্টি হতে পারে।

Ground water drought-এর কারণ ঃ ভূগর্ভস্থ জলস্তর থেকে পাম্প করে অতিরিক্ত জল তুলে নিয়ে চাষাবাদ ও অন্যান্য দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করার ফলে ভূগর্ভে জলের ঘাটতি সৃষ্টি হচ্ছে। এই অবস্থায় স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত পরিস্থিতিতেও খরার সৃষ্টি হতে পারে। দাক্ষিণাত্যে এমনিতেই পাথুরে জমির জন্য জল মাটির ভিতর প্রবেশ করতে পারে না। সেখানে ভূগর্ভস্থ জলের অতিরিক্ত ব্যবহার পরিস্থিতি আরও ঘোরালো করে তোলে।

ভারতবর্ষে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 500 ফুটের কম গভীর অ্যাকুইফারের ব্যবহার হয়। ধনী কৃষকেরা শক্তিশালী পাম্প বসিয়ে মাটির তলা থেকে জল তুলে খরা পরিস্থিতি দূর করে নানান ফসল ফলাচ্ছে। এই কাজের জন্য স্বাভাবিক জলস্তর অনেক নীচে নেমে যাচ্ছে। ফলে গরিব চাষিরা যারা সাধারণ কূপ-নলকূপের উপর নির্ভর করে, শক্তিশালী পাম্প কিনতে পারে না,

তারা জল পাচ্ছে না। তাদের জন্য খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। একই এলাকায় ধনীদের বেহিসেবি জল ব্যবহারের জন্য শুধু দরিদ্ররা খরায় আক্রান্ত হচ্ছে।

গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন এই সমস্যা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে এলাকায় পাম্পের সংখ্যা আরও বেড়ে যাচ্ছে। খরা আরও তীব্র হচ্ছে।

বছরের শুষ্ক সময়ে কৃষি এবং মূলত আঙুর, শাকসবজি, ফুল প্রভৃতি অর্থকরী ফসলের চাষের জন্য এই সমস্যা আরও বাড়ছে। কোলার এবং অন্যান্য আধাশুষ্ক অঞ্চলে এই সমস্যা দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশে এই ধরনের খরার উদাহরণ বেশি দেখা যায়।

রাস্তা তৈরি, নগরায়ণ, শিল্পায়ন প্রভৃতি তথাকথিত উন্নয়নের জন্য ভূপৃষ্ঠের উপরের খাল-বিল, পুকুর ও অন্যান্য জলাশয় বুজিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু এই অঞ্চলগুলি দিয়েই জল ভূগর্ভে অ্যাকুইফারে অনুপ্রেবশ করে, Groundwater recharge হয়। Recharging এলাকাগুলিকে ধ্বংস করে ফেলার ফলে এই ধরনের খরা আরও তীব্র হয়।

কৃষিসংক্রান্ত খরা বা Agricultural drought ঃ কৃষিসংক্রান্ত খরা আলোচনা করার আগে শুষ্কতা সূচক বা Aridity index কী বুঝে নেওয়া দরকার।

$$\text{AI (Aridity index)} = \frac{\text{PET-AET}}{\text{PET}} \times 100$$

PET = Potential evopotranspiration বা বাষ্পীভবন-প্রস্বেদন সর্বোচ্চ যতটা হতে পারে

AET = Actual evopotranspiration বা বাষ্পীভবন-প্রস্বেদন প্রকৃতপক্ষে কত হয়েছে।

বছরের প্রতি সপ্তাহে AI নির্ণয় করা হয়। এবার বছরের ওই সময়ে স্বাভাবিক যা থাকা উচিত সেই তুলনায় কত কম আছে (negative anomaly) সেটা হিসেব করা হয়। সেই অনুযায়ী কৃষিজ ফসল কোনোরকম আর্দ্রতার অভাব (moisture stress) অনুভব করছে কি না, তা হিসাব করা হয়।

শুষ্কতা সূচকের স্বাভাবিকের চেয়ে কত কম (negative anomaly) তার উপর নির্ভর করে কৃষি সংক্রান্ত খরার শ্রেণিবিভাগ করা হয়।

AI anamoly	Severity class
1-25	অল্প খরা (mild arid)
26-50	মাঝারি খরা (moderate arid)
> 50	তীব্র খরা (Severe arid)

AI-এর পাশাপাশি অনেক সময় MAI or Moisture availability index-ও হিসাব করা হয়। IMD, দেশের বিভিন্ন কৃষি জলবায়ু অঞ্চলে (agroclimatic zone) অবস্থিত 169টি স্টেশনের সংগৃহীত তথ্য দিয়ে সাপ্তাহিক AI anomaly মানচিত্র নির্মাণ করে।

কৃষি সংক্রান্ত খরা বা Agricultural drought-এর কারণ : ভারতবর্ষে সবুজ বিপ্লব ঘটার পর কৃষি সংক্রান্ত খরার প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে। কারণ—উচ্চফলনশীল ফসল প্রজাতি চাষ করতে বেশি জলের দরকার হয়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, যেখানে কেবলমাত্র উচ্চফলনশীল গম চাষ (wheat monoculture) হয়, সেখানে কৃষি-খরা সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষে জলবায়ু, মৃত্তিকা, ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যুগ যুগ ধরে প্রচলিত, সময়-পরীক্ষিত ভূমি ব্যবহার রীতি এবং ফসল নির্বাচন এই নতুন সবুজ বিপ্লবে প্রয়োগ করা হয় না। ফলে সমস্যা বাড়ে। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশের আধাশুষ্ক অঞ্চলে, আগে নিম্নমানের মিলেট চাষ হত, জলও কম প্রয়োজন হত। ওই সব স্থানে এখন বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রে আখ, আঙুর, অথবা ধান চাষ হচ্ছে। ফলে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হলেও কৃত্রিম খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে।

অর্থনৈতিক খরা বা Economic drought-এর কারণ—ফসল উৎপাদন নানান কারণে কমে যেতে পারে। যেমন— অবৈজ্ঞানিক প্রথায় এবং অতিরিক্ত খননকার্যের ফলে মাটিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে। কেননা খনি তৈরির জন্য প্রচুর অরণ্য ধ্বংস হয়। প্রস্বেদন হার কমে গিয়ে আবহাওয়া শুষ্ক হয়ে যায়। মাটির জলধারণক্ষমতা কমে যায়। খনি থেকে উদ্ভূত বিপজ্জনক তরল বর্জ্য মাটিতে, ভূপৃষ্ঠস্থ জলে মিশে গিয়ে মাটির স্থায়ী ক্ষতিসাধন করে।

অতিরিক্ত এবং পরিকল্পনাহীন নগরায়ণের জন্যেও মাটির জলধারণ ক্ষমতা ও উর্বরতা কমে যেতে পারে। কংক্রিট নির্মাণের আতিশয্যের কারণে ভূগর্ভে জল প্রবেশের পথ বন্ধ হয়ে যায়। জনসংখ্যার চাপ ও নানান শিল্পের জন্য প্রচুর জল ভূগর্ভ থেকে তুলে নেওয়া হয়। ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে যায়। স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত পরিস্থিতিতেও জলকষ্ট শুরু হয় এবং কৃত্রিম খরা পরিস্থিতি তৈরি হয়।

ভারতবর্ষের খরা আক্রান্ত অঞ্চল (Drought affected areas of India) :

(1) গুজরাট

(2) রাজস্থান এবং পাঞ্জাব ও হরিয়ানার সংলগ্ন অঞ্চল

(3) উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ

(4) মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশ

(5) মহারাষ্ট্রের মধ্যাঞ্চল

(6) কর্ণাটকের মধ্যাঞ্চল

(7) রায়াল সীমা

খরার অর্থনৈতিক সংজ্ঞা (Definition of Economic Drought)

খরার সঙ্গে ফসল উৎপাদনের ওতপ্রোত সম্পর্ক আছে। তাই উৎপাদনভিত্তিক অর্থনৈতিক সংজ্ঞাও খরার জন্য দেওয়া যেতে পারে। কোনো এলাকায় ফসল উৎপাদন যদি এমন কমে যায়, যাতে সার্বিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখনও ওই এলাকা খরা পীড়িত বলা যাবে।

এক নজরে খরা সৃষ্টির কারণ

(1) প্রধান কারণ হল আবহাওয়ার অস্থিরতায় বৃষ্টিপাত কমে যাওয়া। এই বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ার অনেক কারণ থাকতে পারে, যেমন—

(ক) মৌসুমি বৃষ্টির অনিশ্চয়তা (স্থানীয় প্রভাব)।

(খ) আবহাওয়ার উষ্ণায়ণ (Global warming) বিশ্বব্যাপী প্রভাব।

(গ) প্রচুর গাছ কেটে ফেলার জন্য আবহাওয়া শুষ্ক হয়ে যাওয়া।

(ঘ) আধাশুষ্ক অঞ্চলে অতিরিক্ত পশুচারণের ফলে তৃণাচ্ছাদন নষ্ট হয়ে যাওয়া।

(ঙ) প্রাকৃতিক কারণে মরুকরণের গ্রাসে পড়া।

(2) বৃষ্টি স্বাভাবিক আছে, কিন্তু ভূমিরূপের জন্য সব জল গড়িয়ে চলে যায়, মাটিতে একটুও জল সঞ্চিত হয় না, সবসময় শুষ্ক থাকে। এইরকম পরিস্থিতিতেও খরার সৃষ্টি হতে পারে।

খরা সৃষ্টির বিস্তৃত ব্যাখ্যা

জলবায়ুসংক্রান্ত খরা বা Meteorological drought-এর কারণ—

কোনো অঞ্চলের জলবায়ুতে বৃষ্টিপাতের অভাবজনিত খরা পরিস্থিতিতে মনে রাখতে হবে যে, **বৃষ্টির পরিমাণের চাইতে বৃষ্টির কার্যকারিতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ**। ছাত্রছাত্রীরা সবাই জানে যে, চেরাপুঞ্জি পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃষ্টিবহুল অঞ্চল। কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত চেরাপুঞ্জি থেকে সমস্ত বৃষ্টির জল ভূমির ঢাল বরাবর গড়িয়ে নীচের অঞ্চলে চলে যায়। তাই চেরাপুঞ্জি ওই প্রচণ্ড বৃষ্টির সুফল পায় না। এটি একটি শুষ্কপ্রায় অঞ্চল।

ভারতবর্ষে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত হল 105 সেন্টিমিটার। পৃথিবীর নিরিখে এই পরিমাণ যথেষ্ট বেশি। কিন্তু এই বৃষ্টিপাত ভারতের সব জায়গায় সমভাবে বন্টিত নয়। আবার বছরের সব সময়ে বৃষ্টি হয় না। সুতরাং সময় এবং স্থান দুটির নিরিখেই বৃষ্টি অসমভাবে বন্টিত। এর সঙ্গে আবার মনে রাখতে হবে প্রতি বছর এই বন্টনের হার সমান থাকে না। বৃষ্টিপাত পরিবর্তনের গুণক (Coefficient of variation-C) নিম্নলিখিতভাবে গণনা করা যায়।

$$C = \frac{\text{মাসিক/বার্ষিক বৃষ্টিপাতের Standard deviation}}{\text{মাসিক/বার্ষিক বৃষ্টিপাতের Mean}} \times 100$$

কোনো এলাকার C-এর মান যত কম হবে, বুঝতে হবে সেখানে বৃষ্টিপাতের খুব একটা হেরফের হয় না। নিশ্চিত বৃষ্টি হয়। কিন্তু কোনো অঞ্চলে C-এর মান খুব বেশি হয়ে গেলে বুঝতে হবে বৃষ্টি সেখানে খুবই অনিশ্চিত।

রাজস্থান, গুজরাট, কচ্ছ প্রভৃতি অঞ্চলে C-এর মান 50%-80%। দাক্ষিণাত্য মালভূমির অভ্যন্তরে C-এর মান 30%-50%। সুতরাং বোঝা যায় রাজস্থান, গুজরাট অঞ্চল ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি খরা প্রবণ। কারণ বৃষ্টি এখানে অনেক বেশি অনিশ্চিত।

কোনো স্থানে আবহাওয়ার অস্থিরতায় বৃষ্টি কমে যেতে পারে। বৃষ্টি কম হওয়ায় কারণগুলি হল—

(1) ক্রান্তীয় অঞ্চলে মৌসুমী বৃষ্টির অনিশ্চয়তা, যেমন—

(a) দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর দেরিতে আসা।

(b) মৌসুমি বায়ুর চাপীয় অক্ষ (axis of the monsoon trough)-এর বিশেষ অবস্থান।

(c) মৌসুমি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিভিন্ন স্থানে অসমভাবে বণ্টিত হওয়া।

(d) মৌসুমি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিভিন্ন বছরে অসমভাবে বণ্টিত হওয়া।

(2) উপক্রান্তীয় (Subtropical) অঞ্চলে বৃষ্টি না হওয়ার মূল কারণ হল উচ্চচাপযুক্ত বায়ুকক্ষের আয়তন বৃদ্ধি এবং বেশিদিন ধরে এক স্থানেই থেকে যাওয়া। আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলের খরা মূলত এই কারণেই হয়।

(3) সমুদ্রে শীতল স্রোত স্ফীত হয়ে উঠে সমুদ্রের গড় পৃষ্ঠ তাপমাত্রা (average surface temperature) যদি কমে যায়, তবে সংলগ্ন বাতাসও শীতল হয়ে পড়ে। ফলে বাতাস প্রসারিত হয়ে যথেষ্ট জল টেনে নিতে পারে না এবং কম বৃষ্টি ঘটায়, ক্যালিফোর্নিয়া এবং চিলিতে প্রায়শই এমন ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়।

(4) মধ্য অক্ষাংশীয় ঝড়ের গতিপথ পরিবর্তন ওই এলাকায় বৃষ্টি না হওয়ার জন্য দায়ী হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রকি পর্বতমালার পূর্বদিকের সমভূমিতে এমন ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়।

(5) **এলনিনো প্রভাব ঃ** প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বদিকে, অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ুর প্রভাবে সমুদ্রের উষ্ণ জল, মহাসাগরের পশ্চিম দিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার দিকে ছুটে যায়। এই উষ্ণ জল

ক্রমাগত পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে সরে যায় বলে শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য পেরু সীমান্তে গভীর সমুদ্র থেকে ঠান্ডা জল স্ফীত হয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠে উঠে আসে। ফলে পেরু সীমান্তে বায়ুর উচ্চচাপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়।

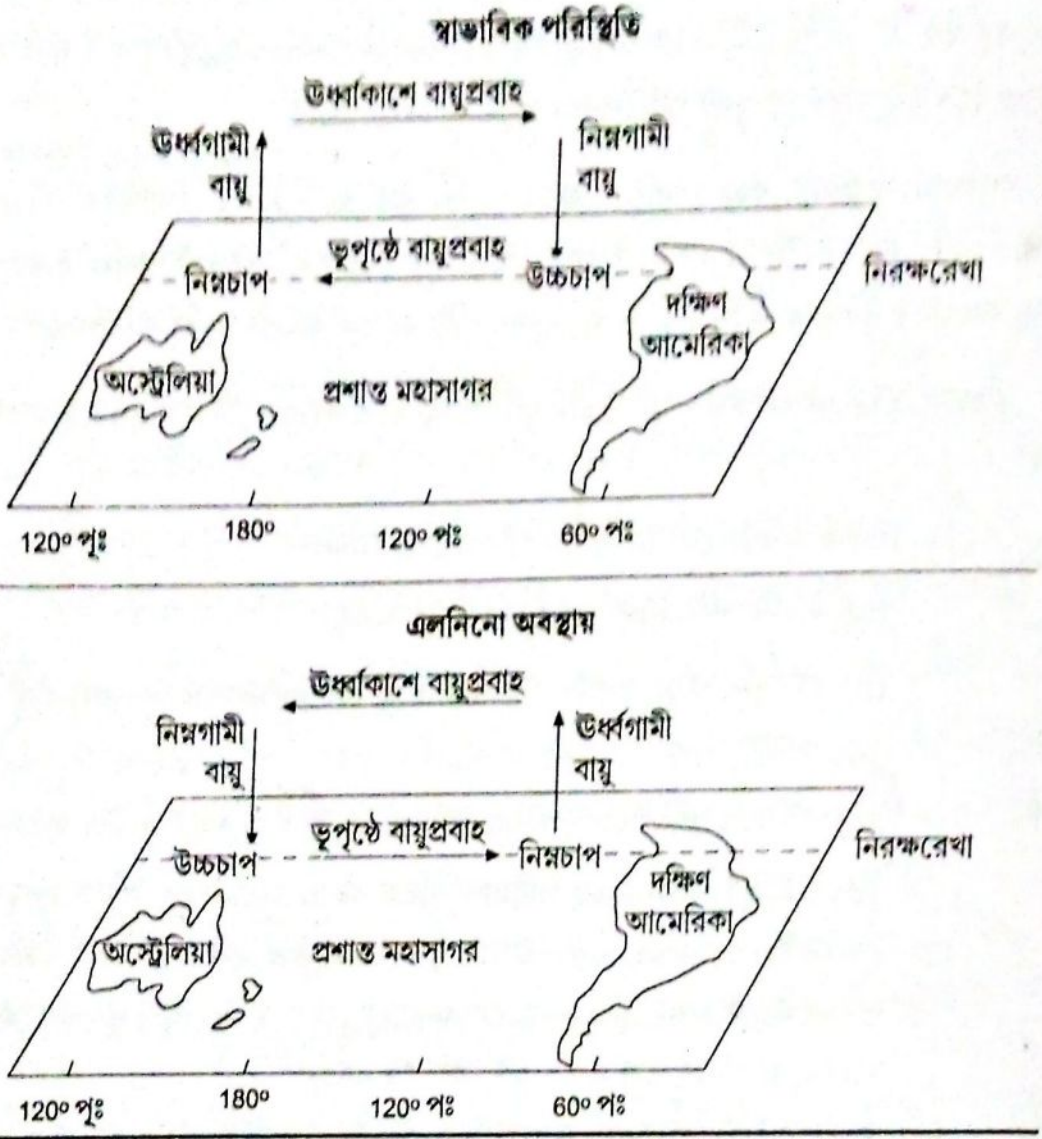

চিত্র 2.3.1 : স্বাভাবিক অবস্থায় এবং এলনিনোর ফলে সৃষ্ট বায়ুচাপ ও বায়ুপ্রবাহের পরিস্থিতি।

সূত্র ঃ Siddhartha, 2007

দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু আড়াআড়িভাবে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করার সময় প্রচুর জল টেনে নেয় এবং ভারতসহ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় বৃষ্টি ঘটায়। ঊর্ধ্বাকাশে ঠিক বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহ দেখা যায়। এই প্রবাহপথ আবহবিদদের কাছে বাতাসের 'ওয়াকার কক্ষ' নামে পরিচিত। কোনো কোনো বছরে ওয়াকার কক্ষ দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু দুর্বল হয়ে পড়ে। ওই বাতাস তখন আর পেরু সীমান্ত থেকে উষ্ণ সমুদ্র জলকে সরাতে পারে না। এই উষ্ণ স্রোতই হল এলনিনো, স্প্যানিশ ভাষায় যার অর্থ শিশু যীশু। সেই

বছরে শীতল পেরু স্রোত বা হামবোল্ড স্রোতের দেখা মেলে না। সমুদ্রের জল স্বাভাবিকের তুলনায় অন্তত 10° সেন্টিগ্রেড উষ্ণ হয়ে পড়ে। এই সময়ে স্বাভাবিক পরিস্থিতি উলটে যায়। প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমদিকে অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপর বায়ুর উচ্চচাপ ও পেরু সীমান্তে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। ফলে ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বৃষ্টি হয় না এবং খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

(6) কোনো কোনো বছরে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আগমনের ঠিক আগে ফিন্ডলেটার (Findlater) জেট বায়ুপ্রবাহের ধাক্কায় পূর্ব আফ্রিকার প্রান্ত থেকে শীতল সোমালি স্রোত আরবসাগরে ঢুকে পড়ে এবং আরবসাগরের পৃষ্ঠ তাপমাত্রা (Surface temperature) অন্তত 10°C কমিয়ে দেয়। ফলে বাষ্পীভবন ও মেঘবৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমে যায়।

(7) **বিশ্বব্যাপী অরণ্যহনন বা Deforestation** বৃষ্টি কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ। বনাঞ্চল জলচক্রের দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে—

(a) বাষ্পায়ন—প্রস্বেদন হার (rate of evapotranspiration) বাড়ানো,

(b) ভূপৃষ্ঠ প্রবাহ (surface run-off) কমানো এই দুটি প্রক্রিয়া না সংঘটিত হলে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যায়, ফলে স্থানীয় বৃষ্টিপাত কমে যায়।

এ ছাড়াও গাছ কেটে ফেললে বাতাসে CO_2-এর পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে **আবহাওয়ার উষ্ণায়ন** আরও দ্রুত হয়। ফলে মাটি ও বাতাস দ্রুত শুকিয়ে যায়। বৃষ্টি আরও অনিশ্চিত হয়ে ওঠে।

(8) মরুকরণ বা desertification প্রক্রিয়ার সঙ্গে বৃষ্টি কমে যাওয়ার যোগ আছে। প্রতিকূল আবহাওয়া এবং মানুষের অবৈজ্ঞানিক বেহিসেবি কার্যকলাপের ফলে ভূপৃষ্ঠস্থ জল ও ভূগর্ভস্থ জল সম্পদের অতিরিক্ত ক্ষয়ের ফলে মরুকরণ হয়। ফলে গাছপালা জন্মায় না এবং বৃষ্টিপাত আরও বেশি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

(9) মাটির লবণায়ন বা salinisation-এর ফলে মাটির উর্বরতা কমে যায়, বনসম্পদ নষ্ট হয়। তার ফলেও বৃষ্টির অনিশ্চয়তা বাড়ে।

জলসম্পদ সংক্রান্ত খরা সৃষ্টির কারণ

জলসম্পদ সংক্রান্ত খরা বা Hydrological drought-কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—

(1) ভূপৃষ্ঠস্থ জলসম্পদ সংক্রান্ত খরা (Surface water drought)

(2) ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ সংক্রান্ত খরা (Ground water drought)

(2) জলাশয়, কূপ, নলকূপ শুকিয়ে যাওয়ার ফলে, নিরাপদ পানীয় জল অমিল হয়ে পড়ে।

(3) অশক্ত, অপুষ্ট, অনাহারী মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ময়লা জল বাহিত রোগ যেমন—কলেরা, আমাশয়, ডায়েরিয়া প্রভৃতি মহামারি রূপে ছড়িয়ে পড়ে। অপুষ্টি ও ভিটামিনের অভাবজনিত বিভিন্ন রোগ যেমন—ক্ষীণ দৃষ্টি, রাতকানা এগুলিরও প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

(4) আবহাওয়ায় তাপপ্রবাহ চলার কারণে প্রচুর গৃহহীন মানুষ মারা যায়।

খরা প্রতিরোধের উপায়

দু'রকমভাবে খরা প্রতিরোধ করা যেতে পারে—

(1) খরা প্রবণ এলাকায় দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা দ্বারা সমস্যা দূর করার চেষ্টা করা।

(2) খরা আক্রান্ত এলাকায় স্বল্পকালীন প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া।

(1) দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা ঃ

(ক) খরা প্রবণ এলাকার পরিসর সঠিকভাবে চিহ্নিত করে, সেখানে খরার প্রকৃত কারণ কি, তা অনুধাবন করতে হবে।

(খ) এলাকায় ভূপৃষ্ঠস্থ এবং ভূগর্ভস্থ প্রাপ্য জলের পরিমাণ কত হতে পারে তা পরিমাপ করার পর, কীভাবে তা সংরক্ষণ করতে হবে, এলাকা অনুযায়ী বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে নির্ধারণ করতে হবে। এবং সাধারণ মানুষকে এই পরিকল্পনায় সক্রিয় শরিক করতে হবে, যাতে পরিকল্পনা প্রকৃত ফলপ্রসূ হয়।

(গ) বৃষ্টির জল সংরক্ষণ (Rainwater harvesting) করা যেতে পারে।

(ঘ) জমির ঢালের মুখে ছোটো ছোটো প্রাচীর তৈরি করে, জল আটকানো যেতে পারে।

(ঙ) খরা সহ্য করতে পারে এমন ফসল চাষ করতে হবে।

(2) স্বল্পকালীন প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ

(ক) খরা শুরু হলে, অবস্থা অনুযায়ী ফসলের প্রকার, বা চাষের প্রকৃতি পরিবর্তন করতে হবে। কৃষকদের পরিস্থিতি অনুযায়ী সঠিক পরামর্শ পৌঁছে দিতে হবে। খরিফ মরশুমে চাষ মার খেলে, রবি ফসল কতটা বেশি উৎপন্ন করা যায়, সেদিকে নজর দিতে হবে।

(খ) মানুষ ও গবাদি পশুর পানীয় জল ও পশুখাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে কৃষক পরিবার যাতে অনাহারে না মরে, তার জন্য বিকল্প কাজের ব্যবস্থা বা ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিভিন্নরকম খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা কীভাবে করা যেতে পারে ?

Meteorological drought প্রতিরোধের উপায়—

ভারতবর্ষের মৌসুমি বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি অনিশ্চিত, ঊর্ধ্বাকাশে জেটস্ট্রিমের প্রবাহ, মৌসুমি অক্ষের অবস্থান, ওয়াকার কক্ষের প্রকৃতি, এল নিনো প্রভাব প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিষয়ের উপর মানুষের কোনো হাত নেই। তাই মৌসুমি বৃষ্টিপাতের সময়, বণ্টন ও পরিমাণ নিশ্চিত করার কোনো উপায় মানুষের হাতে নেই।

কাজেই এক্ষেত্রে একটা কাজই করা যেতে পারে। সেটা হল কোন বছরে বৃষ্টিপাত কেমন হতে পারে, তার পূর্বাভাসের ব্যবস্থা করা।

Indian Meteorological Department বা IMD-এর তত্ত্বাবধানে সারা ভারতবর্ষের অসংখ্য ছোটো-বড়ো আবহাওয়া কেন্দ্রে বিভিন্নরকম আবহাওয়া তথ্য সারাবছর ধরে সংগ্রহ করা হয়। তারপর পুণের মূল অফিসে ওই সকল তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়।

ভারতবর্ষে জিওস্টেশনারি কৃত্রিম উপগ্রহ ইনস্যাট (Indian National Satellite)-এর সাহায্যে প্রতিদিনের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করা হয়।

এ ছাড়া ভারতের কৃষি দপ্তরের ও দেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় আবহাওয়া তথ্যসংগ্রাহক কেন্দ্র আছে।

এই সকল তথ্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন—

(a) Dynamic Stochastic Transfer Model,

(b) Regression Model,

(c) Medium Range Weather Forecasting System প্রভৃতি।

বিশ্লেষণ করার পর আগামী বর্ষা ঋতুতে বৃষ্টি কেমন হতে পারে তার আভাস পাওয়া যায়। তবে মৌসুমির বৃষ্টির অনিশ্চিত প্রকৃতির জন্য কোনো পূর্বাভাসই 100% মিলে যাওয়া সম্ভব নয়।

তবে যদি আভাস পাওয়া যায় যে, আগামী ঋতুতে বৃষ্টি কম হতে পারে, তবে আগে থেকেই সাবধান হওয়া যায়। খাদ্যশস্যের সঞ্চয় বাড়িয়ে নেওয়া যায়। আগে থাকতেই আমদানির

ব্যবস্থা করে রাখা যায়। খরা সহ্য করতে পারে এমন ফসল চাষ করার বন্দোবস্ত করা যায়। কৃষকদের আগে থেকে সচেতন করা যেতে পারে। খাদ্যশস্য ও অন্যান্য জিনিসপত্রের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার জন্য আগে থাকতেই বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

Hydrological drought প্রতিরোধের উপায়—

এই ধরনের খরা তিনভাবে মোকাবিলা করা যেতে পারে—

(a) জৈব পদ্ধতি (Biological method)

(b) প্রযুক্তিগত পদ্ধতি (Engineering method)

(c) স্থানীয় মানুষের খরা মোকাবিলায় যোগদান (Participation of local people)

জৈব পদ্ধতি—

এই পদ্ধতিতে প্রথমেই খরা আক্রান্ত এলাকায় অরণ্যহননের সমস্যা আছে কি না তা যাচাই করে নিতে হবে। কেননা গাছ কেটে ফেললে মাটিতে জলের অনুপ্রবেশের হার কমে যায় এবং ভূপৃষ্ঠপ্রবাহ ও বন্যার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আর মাটি জল ধরে রাখতে না পারার জন্য শুষ্ক ঋতুতে খরার সৃষ্টি হয়।

এর পরবর্তী পর্যায়ে ধাপে ধাপে বনসৃজন এবং জলবিভাজিকা প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। এর ফলে বর্ষায় যেমন বন্যার সমস্যা কমবে, তেমন ভূগর্ভে জলস্তর বাড়বে এবং শুখা মরশুমে খরার সম্ভাবনাও কমে যাবে।

কোনো জায়গায় যদি একই ধরনের পাইন বা ইউক্যালিপ্টাসের বাগিচা থাকে, তবে ধীরে ধীরে জমির ব্যবহার বদল করে অন্য ধরনের গাছ লাগাতে হবে যাতে মাটি এবং চারপাশের আবহাওয়া অতিরিক্ত শুকিয়ে না যায়। বড়ো পাতার ছাউনি আছে (Canopy cover) আছে এমন গাছ লাগাতে হবে। ফলে মাটিতে সরাসরি বৃষ্টির কণার আঘাত লেগে ভূমিক্ষয় হবে না। আবার মাটিতে জল ঢুকে ভূগর্ভস্থ জলস্তর বাড়িয়ে তুলবে।

প্রযুক্তিগত পদ্ধতি—

নানাধরনের প্রযুক্তির সাহায্যে ভূগর্ভে অ্যাকুইফারগুলিতে জল ঢোকানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব। যেমন— পাহাড়ি অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বহুতল বিশিষ্ট অরণ্য তৈরি করা যেতে পারে, যাতে ওই অরণ্যে বড়ো বড়ো গাছ, ছোটো গাছ, ঝোপঝাড়, লতাপাতা, ঘাস প্রভৃতি ধাপে ধাপে থাকে। এইরকম অরণ্য ভূপৃষ্ঠ প্রবাহে বাধা দেয়। ফলে অনেক বেশি জল মাটির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে।

সমতলক্ষেত্রে বর্ষায় বন্যার জলকে বেরতে না দিয়ে বড়ো বড়ো গর্ত এবং খাত কেটে সেখানে জমিয়ে রাখা যেতে পারে। ওই জমা জল কিছুটা মাটির ভিতর ঢুকবেই এবং ভূগর্ভস্থ জলস্তরকে বাড়িয়ে তুলবে।

আধাশুষ্ক অঞ্চলে বর্ষার সময়ে সৃষ্টি হওয়া ছোটো ছোটো নদীর মুখে মাটি পাথর দিয়ে ছোটো বাঁধ তৈরি করে জল আটকানো যায়। এই জলও মাটির তলায় কিছুটা ঢুকতে পারে।

পরিত্যক্ত কুয়োগুলিকেই এভাবে ভূগর্ভস্থ জলস্তরে জল ঢোকানোর কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমেদাবাদের কাছে কুরুক্ষেত্রে ঘগ্গর নদী উপত্যকায় সাইফন পাম্পের সাহায্যে জমা জল ভূগর্ভে পাঠানো হচ্ছে।

বর্ষার জল বড়ো বড়ো পুকুরে জমিয়েও এভাবে ভূগর্ভে ঢোকানো যেতে পারে।

বড়ো বড়ো খাল কেটে বৃষ্টিবহুল অঞ্চল থেকে শুষ্ক এলাকার জল নিয়ে আসা যেতে পারে। ভারতে রাজস্থান ক্যানাল প্রকল্প এইভাবেই জলস্ফীত হিমালয়ের নদীগুলি থেকে খাল কেটে থর মরুভূমির জয়সলমীর-বিকানির প্রভৃতি অঞ্চলে জল নিয়ে এসেছে।

স্থানীয় মানুষের খরা মোকাবিলায় যোগদান—

সাধারণ মানুষ খরা সম্পর্কে সচেতন ও প্রশিক্ষিত হলে সরকারি ব্যবস্থার ভরসায় না থেকে তারা নিজেরাই শ্রমদান করে, নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে জল সমস্যার সমাধান করতে পারে। ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রে, কর্ণাটকে, রাজস্থানের বিভিন্ন গ্রামে এমন বহু ঘটনা ঘটেছে।

এ ছাড়া কোনো এলাকায় খরা শুরু হয়ে গেলে কৃষি নির্ভর সাধারণ মানুষের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান প্রয়োজন। উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে এনে খাদ্যশস্যের সঠিক বণ্টন প্রয়োজন। খরাপীড়িত মানুষের কি ধরনের সাহায্য দরকার তা বুঝে সেইমতো ত্রাণ সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন।

Agricultural drought প্রতিরোধের উপায়—

এই ধরনের খরা মোকাবিলায় নিম্নলিখিত পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন—

(1) খরা পরিস্থিতিতে সঠিক শস্য নির্বাচন করতে হবে।

(2) যেহেতু উচ্চফলনশীল শস্য চাষে বেশি জল লাগে, তাই সেগুলিকে বাদ দিয়ে, দেশীয় খরা প্রতিরোধী শস্য চাষ দরকার।

(3) আবহাওয়ার পরিস্থিতি অনুযায়ী সঠিক শস্যাবর্তন পালন করতে হবে।

খরা প্রতিরোধে সরকারি ব্যবস্থা

আগে থাকতে পূর্বাভাস জানানোর জন্য এবং ব্যবস্থা নেবার জন্য অর্থাৎ প্রস্তুত থেকে খরা মোকাবিলার জন্য কৃষিদপ্তর একটি Weather watch group তৈরি করেছে। তা ছাড়া কৃষি ও সমবায় দপ্তরের জন্য মহাকাশ দপ্তর National Agricultural Drought Assessment and Management System (NADAMS) স্থাপন করেছে।

খরার মানচিত্র নির্মাণ (Drought Mapping)

যদিও আগে আমরা আলোচনা করেছি যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে খরার সংজ্ঞা দেওয়া যায়, মানচিত্র আঁকার ক্ষেত্রে জলবায়ুসংক্রান্ত সংজ্ঞাটি গ্রহণ করলে আঁকার সুবিধা বেশি।

ধরা যাক, আমার কাছে পশ্চিমবঙ্গের 19টি জেলার 50 বছরের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের হিসাব আছে। এবার দেখা যাক, আমরা মানচিত্র কীভাবে করব।

(1) প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের 19টি জেলার প্রত্যেকটি থেকে একটি করে প্রতিনিধি কেন্দ্র নির্বাচন করলাম, যার বৃষ্টিপাতের হিসাব ধরে গণনা করা হবে।

(2) যে-কোনো একটি কেন্দ্রের 50 বছরের বৃষ্টিপাত যোগ করে গড় বার করে ওই কেন্দ্রের স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত গণনা করতে হবে। এভাবে 19টি কেন্দ্রেরই স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত (Normal rainfall) পাওয়া যাবে।

(3) এবার প্রতিটি কেন্দ্রে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের 75% কত হয় তা গণনা করতে হবে।

(4) প্রতিটি কেন্দ্রে 50 বছরের হিসাবের মধ্যে যে যে বছরের বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের 75%-এর কম, সেইগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে। অর্থাৎ জলবায়ু সংক্রান্ত খরার সংজ্ঞা অনুযায়ী ওই বছরে ওই কেন্দ্রে স্বাভাবিকের 25 শতাংশ বা আরও কম বৃষ্টি হয়েছে (–ve departure from normal rainfall $\geq$ 25%)। সুতরাং কেন্দ্রটি ওই বছরে খরায় আক্রান্ত।

(5) বিভিন্ন বছরে যে কেন্দ্রগুলি এই পদ্ধতিতে চিহ্নিত হল, সেগুলিতে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের 25% বা আরও কম তো জানা গেল, এবার জানতে হবে ওই বছরগুলিতে বৃষ্টিপাত কত কম তার প্রকৃত হিসাব (Actual –ve departure from normal rainfall), কারণ ওই বছরগুলিতে স্বাভাবিকের চেয়ে বিচ্যুতির মানগুলি দেখিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে বারগ্রাফ আঁকা যেতে পারে।

(6) এবারে এক-একটি কেন্দ্রে 50 বছরের মধ্যে এমন ঋণাত্মক বিচ্যুতি (–ve departure) ক'বার হয়েছে সেটা গুনতে হবে। ধরা যাক, দিনহাটাতে 50 বছরে 6

বার খরা হয়েছে। তবে 100 বছরে 12 বার হয়েছে। এইভাবে খরার পুনরাবৃত্তির হার শতাংশের হিসাবে (Drought frequency percentage) বার করতে হবে।

(7) এবারে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে শতাংশের হিসেবে ওই খরা-পুনরাবৃত্তির হার (Drought frequency percentage)-গুলি বিভিন্ন কেন্দ্রে বসিয়ে আইসোপ্লেথ আঁকতে হবে। যেমন ধরা যাক, পশ্চিমবঙ্গে 5%, 10% এবং 15%—এই তিনটি আইসোলাইন টানা গেল। খরার সংজ্ঞা অনুযায়ী যদি কোনো এলাকা 100 বছরে অন্তত কুড়িবার খরা আক্রান্ত না হয়, তবে এলাকাটিকে খরাপ্রবণ বলা যাবে না। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে কিছু কিছু স্থানে স্বল্পকালীন খরার ঘটনা ঘটলেও সার্বিকভবে রাজ্যটিকে খরাপ্রবণ বলা যাচ্ছে না।

(8) সংজ্ঞা অনুসারে কোনো বছরে কোনো এলাকার 20% অঞ্চল যদি খরা পীড়িত হয়, তবে সেই এলাকাটিকে খরায় আক্রান্ত বলে ঘোষণা করা যায়। এবারে আমাদের গণনাটিকে আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখব। প্রথমে পশ্চিমবঙ্গকে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে ভাগ করলাম। উত্তরবঙ্গে আছে 6টি জেলায় 6টি কেন্দ্র, দক্ষিণবঙ্গে আছে 13টি জেলায় 13টি কেন্দ্র। এবার উত্তরবঙ্গে যদি ($6 \times 20\% = 1.2$, অর্থাৎ এক-এর বেশি) অন্তত দুটি কেন্দ্রে খরা হয়, তবে ওই বছর উত্তরবঙ্গ খরাপীড়িত এমন বলা যাবে। একইভাবে কোনো বছরে দক্ষিণবঙ্গে ($13 \times 20\% = 2.6$), অন্তত তিনটি কেন্দ্রে যদি খরা হয়, তবে ওই বছর দক্ষিণবঙ্গে খরা হয়েছে ধরতে হবে।

উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে পুরো পশ্চিমবঙ্গে ($1.2+2.6 = 3.8$) অন্তত চারটি কেন্দ্রে খরা হলে সেই বছর পুরো রাজ্যেই খরা পীড়িত ধরতে হবে। এই জিনিসটি ম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতে অঙ্কন করা যাবে।

বার খরা হয়েছে। তবে 100 বছরে 12 বার হয়েছে। এইভাবে খরার পুনরাবৃত্তির হার শতাংশের হিসাবে (Drought frequency percentage) বার করতে হবে।

(7) এবারে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে শতাংশের হিসেবে ওই খরা-পুনরাবৃত্তির হার (Drought frequency percentage)-গুলি বিভিন্ন কেন্দ্রে বসিয়ে আইসোপ্লেথ আঁকতে হবে। যেমন ধরা যাক, পশ্চিমবঙ্গে 5%, 10% এবং 15%—এই তিনটি আইসোলাইন টানা গেল। খরার সংজ্ঞা অনুযায়ী যদি কোনো এলাকা 100 বছরে অন্তত কুড়িবার খরা আক্রান্ত না হয়, তবে এলাকাটিকে খরাপ্রবণ বলা যাবে না। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে কিছু কিছু স্থানে স্বল্পকালীন খরার ঘটনা ঘটলেও সার্বিকভবে রাজ্যটিকে খরাপ্রবণ বলা যাচ্ছে না।

(8) সংজ্ঞা অনুসারে কোনো বছরে কোনো এলাকার 20% অঞ্চল যদি খরা পীড়িত হয়, তবে সেই এলাকাটিকে খরায় আক্রান্ত বলে ঘোষণা করা যায়। এবারে আমাদের গণনাটিকে আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখব। প্রথমে পশ্চিমবঙ্গকে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে ভাগ করলাম। উত্তরবঙ্গে আছে 6টি জেলায় 6টি কেন্দ্র, দক্ষিণবঙ্গে আছে 13টি জেলায় 13টি কেন্দ্র। এবার উত্তরবঙ্গে যদি ($6\times20\% = 1.2$, অর্থাৎ এক-এর বেশি) অন্তত দুটি কেন্দ্রে খরা হয়, তবে ওই বছর উত্তরবঙ্গ খরাপীড়িত এমন বলা যাবে। একইভাবে কোনো বছরে দক্ষিণবঙ্গে ($13\times20\% = 2.6$), অন্তত তিনটি কেন্দ্রে যদি খরা হয়, তবে ওই বছর দক্ষিণবঙ্গে খরা হয়েছে ধরতে হবে।

উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে পুরো পশ্চিমবঙ্গে ($1.2+2.6 = 3.8$) অন্তত চারটি কেন্দ্রে খরা হলে সেই বছর পুরো রাজ্যেই খরা পীড়িত ধরতে হবে। এই জিনিসটি ম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতে অঙ্কন করা যাবে।